ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা
IOM ISLAMIC ONLINE MADRASAH

কুরআন-হাদীসের আলোকে দুনিয়াতে ফেৎনা-ফাসাদ ও বালা-মুসিবত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণসমূহ

[আলিম প্রিপারেটরি স্নাতক প্রোগ্রামের **RAM 302** কোর্সের আংশিক পরিপূর্ণতার আবশ্যিক প্রয়োজনে]

জমাদানে:

তাসরুজ্জামান বাবু

রোল: ২০২০১২৬৬

জুন ২০২৩

কুরআন-হাদীসের আলোকে দুনিয়াতে ফেৎনা-ফাসাদ ও বালা-মুসিবত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণসমূহ

ভূমিকা: বর্তমানে আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি তা ফিতনা-ফাসাদ, বালা-মুসিবতে কানায় কানায় পূর্ণ। এইসব ফিতনা-ফাসাদ ও বালা মুসিবত আমাদেরকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে এসব ফিতনা-ফাসাদ ঈমানের মতো মূল্যবান দৌলত হরণকারীর ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হয়। যুগের প্রেক্ষাপটে নিত্য-নতুন ফিতনা ফাসাদের আবির্ভাব ঘটলেও মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও হাদিসের কিতাবগুলোতে এসব ফিতনা-ফাসাদের ব্যাপারে ১৪০০ বছর পূর্বেই যথেষ্ট পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে এবং এসব থেকে হেফাজতের পথ বাতলে দেওয়া হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভে কুরআন-হাদিসের আলোকে দুনিয়াতে ফিতনা-ফাসাদ ও বালা-মুসিবত বৃদ্ধির কারণ ও প্রতিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ফিতনা-ফাসাদ কী?

ফিতনা (فتن) ও ফাসাদ (فساد) উভয়টিই আরবি শব্দ। আল মাওয়ারিদ, আল কামুসুল মুহিত, লিসানুল আরব, আল মুনাজ্জিদ প্রভৃতি আরবি অভিধান অনুসারে ফিতনা অর্থ বিরোধ, সংঘর্ষ, বিদ্রোহ, লোভ, বিপর্যয়, পরীক্ষা-যাচাই ইত্যাদি [১]।
অপরদিকে উক্ত অভিধানগুলোতে ফাসাদ হিসেবে দুর্নীতি, বিচ্যুতি, ধ্বংস, অবক্ষয়, বিভেদ, অশান্তি ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে।
শব্দদুটোর আভিধানিক অর্থের মতোই তাদের পারিভাষিক অর্থ। পবিত্র কুরআন মাজিদেও আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ফিতনা ও ফাসাদ শব্দদুটো উপর্যুক্ত অর্থ বোঝাতেই ব্যবহার করেছেন। এমনকি কখনো কখনো ফাসাদ শব্দটিও ফিতনা শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে।
পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে,

وَ الۡفِتۡنَۃُ اَشَدُّ مِنَ الۡقَتۡلِ

অর্থাৎ, আর ফিতনা হত্যার চেয়ে কঠিনতর (সুরা বাকারাঃ ১৯১)।
এখানে ফিতনা শব্দটির অর্থ জুলুম ও অত্যাচার [তাফসিরে তাওযীহুল কুরআন]।
আবার সুরা আল আনফালে এরশাদ হয়েছে,

وَ قَاتِلُوۡهُمۡ حَتّٰی لَا تَکُوۡنَ فِتۡنَۃٌ وَّ یَکُوۡنَ الدِّیۡنُ کُلُّهٗ لِلّٰهِ

অর্থাৎ, আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় (সুরা আল আনফালঃ ৩৯)
এই আয়াতেও ফিতনা শব্দের দ্বারা কুফর ও শিরক বোঝানো হয়েছে [তাফসিরে তাবারি, ইবনে কাসির, ও তাফসিরে আহসানুল বায়ান]।

একইভাবে ফাসাদ শব্দটির ব্যবহারের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, পবিত্র কুরআন মাজিদের সুরা বাকারায় এরশাদ হয়েছে,

وَ اِذَا قِیۡلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُوۡا فِی الۡاَرۡضِ ۙ قَالُوۡۤا اِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُوۡنَ

অর্থাৎ, আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা যমীনে ফাসাদ করো না', তারা বলে, 'আমরা তো কেবল সংশোধনকারী' [সুরা আল বাকারা: ১১]।
এই আয়াতে ফাসাদ শব্দের অর্থ আল্লাহর অবাধ্যতা [আত তাফসিরুস সহীহ]
আবার, একই সুরার পরের আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلَاۤ اِنَّهُمۡ هُمُ الۡمُفۡسِدُوۡنَ وَ لٰکِنۡ لَّا یَشۡعُرُوۡنَ

অর্থাৎ, জেনে রাখ, নিশ্চয় তারা ফাসাদকারী; কিন্তু তারা বুঝে না (সুরা আল বাকারা: ১২)
এই আয়াতে ফাসাদ শব্দটি অশান্তি, হাঙ্গামা বা সন্ত্রাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে [তাফসিরে আহসানুল বায়ান]।
একই সুরার অন্যত্র মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اِذَا تَوَلّٰی سَعٰی فِی الۡاَرۡضِ لِیُفۡسِدَ فِیۡهَا وَ یُهۡلِکَ الۡحَرۡثَ وَ النَّسۡلَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا یُحِبُّ الۡفَسَادَ

অর্থাৎ, আর যখন সে ফিরে যায়, তখন যমীনে প্রচেষ্টা চালায় তাতে ফাসাদ করতে এবং ধ্বংস করতে শস্য ও প্রাণী। আর আল্লাহ ফাসাদ ভালবাসেন না (সুরা আল বাকারা: ২০৫)
এই আয়াতেও ফাসাদ শব্দের অর্থ হলো অশান্তি সৃষ্টি করা [তাফসিরে আহসানুল বায়ান, তাওযীহুল কুরআন]।
একইভাবে সুরা আল আরাফের ৫৬ নং আয়াতে, সুরা আল কাসাসের ৭৭ নং আয়াতে ফাসাদ শব্দটি দুর্নীতি বা বিপর্যয় সৃষ্টি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে [তাফসিরে জাকারিয়া, তাফসিরে আহসানুল বায়ান]।

অতএব, দেখা গেল ফিতনা ও ফাসাদ শব্দ দুটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাছাকাছি অর্থ বহন করে। এই কারণে বাংলা ভাষায় অধিকাংশ সময়ই বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয়, পরীক্ষা, অশান্তি, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ইত্যাদি বোঝাতে ফিতনা ও ফাসাদ শব্দদুটির সমাসবদ্ধ রূপ 'ফিতনা-ফাসাদ' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করা হয়।
বালা-মুসিবত কী?: বালা-মুসিবতও সমার্থক শব্দ। এর দ্বারা বিপদ-আপদ বোঝানো হয়। দুনিয়াতে বালা-মুসিবত বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ হচ্ছে ফিতনা-ফাসাদ বৃদ্ধি।

ফিতনা-ফাসাদের ধরণঃ ফিতনা-ফাসাদের সংখ্যা এক কথায় অসংখ্য এবং অনির্ণেয়। প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আঃ) এর আগমনের পর থেকে এখন পর্যন্ত নানা ফেতনা-ফাসাদ নানা রঙে-ঢঙে এসেছে, কেয়ামত পর্যন্ত আসবেও। তবে সেগুলোকে কিছু নির্দিষ্ত ধরণ বা ছাঁচে ফেলে বর্ননা করা সম্ভব। নিচে ফিতনা –ফাসাদের বিবিধ ধরণ উল্লেখ করা হলো:

১। আকিদাগত ফিতনা: আকিদা-বিশ্বাসের সাথে জড়িত ফিতনাগুলোকে এই প্রকরণের মধ্যে ফেলা যায়। এই ফিতনাগুলো এতই মারাত্মক যে কোনো কোনোটা রীতিমতো ঈমানবিধ্বংসী। আকিদাগত ফিতনাগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন এতেকাদি ফেরকাসমূহ, যেমন: শিয়া, মুনকিরিনে হাদিস, খারেজি, জাবরিয়া, কাদরিয়া, জাহমিয়া, মুতাজিলা, খলকে কুরআন ইত্যাদি। এছাড়াও আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের মোড়কে ঈমানবিধ্বংসী আকীদাগুলোকেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন: বিবর্তনবাদ, নারীবাদ, সমকামিতাবাদ, ট্রান্সজেন্ডারবাদ, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি।
২। ইবাদতগত ফিতনা: এই ধরণের ফিতনা ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত। এককথায় সময়ে সময়ে আবির্ভূত নব নব বিদআত, আমলি শিরক ইত্যাদিকে ইবাদতগত ফিতনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।
৩। আখলাকগত ফিতনা: নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয় আখলাকগত ফিতনার অন্তর্ভুক্ত। যেমন: অসাধুতা, প্রতারণা, গীবত, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, অনৈতিকতা ইত্যাদি। খাইরুল কুরুনের যামানার অপেক্ষা বর্তমান সময়ে অনেক বেশি নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাই ধরা যাক। বর্তমান সময়ে অতীতের চেয়ে ঢের বেশি মাপে কম দেওয়া, পণ্যে ভেজাল দেওয়া, পণ্য মজুদ রেখে কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করা ইত্যাদি ফেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪। সামাজিক ও রাজনৈতিক ফিতনা: রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব, শ্রেণিবৈষম্য, বিচারহীনতা, বলপ্রয়োগ, ক্ষমতার অপব্যবহার, বর্ণপ্রথা ইত্যাদি ফিতনাকে সামাজিক অ রাজনৈতিক ফিতনার মধ্যে গণ্য করা যায়।
৫। সম্পদগত ফিতনা: ধনসম্পদ, মালিকানা, অর্থগত ও সম্পদগত লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট ফিতনাগুলোকে এই প্রকরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অর্থসম্পদের প্রতি সীমাহীন লোভ, সম্পদের শোষণ, মাত্রাতিরিক্ত পুঁজিবাদীতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ব্যক্তিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আর্থিক দুর্নীতি ইত্যাদি কিছু উল্লেখযোগ্য সম্পদগত ফিতনার উদাহরণ।
৬। জ্ঞানগত ও তথ্যগত ফিতনা: আধুনিক যুগে সংবাদ মাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে তথ্যগত ও জ্ঞানগত এই ফিতনা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ভ্রান্ত সংবাদ, মিথ্যা তথ্য, বিকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল, বিকৃত ইতিহাস ইত্যাদি ফিতনা পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে বর্তমান যুগে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।
৭। নফসগত ফিতনা: নফসের ধোঁকায় মানুষ কামনা-বাসনা, আসক্তি, ভোগবিলাস ইত্যাদি রিপুতুষ্টির কাজে অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে গিয়ে হক পথ থেকে দূরে সরে যায়, এটাও এক ধরণের ফেতনা। হেডোনিজম নামে একটি মতবাদ আছে যেখানে ব্যক্তিগত ভোগবিলাসকে জীবনের পরম লক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর বিপরীতে ইসলাম এসব মতবাদ থেকে শতভাগ মুক্ত একটি আখিরাতমুখী জীবনব্যবস্থা।

ফিতনা-ফাসাদ বৃদ্ধির কারণ: পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে ফিতনা-ফাসাদ বৃদ্ধির কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো:
১। পার্থিব জীবনের প্রতি ভালোবাসা: পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাসের প্রতি মত্ত হয়ে যাওয়া ফেতনা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। মানুষ যখন আখেরাতের চেয়ে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে ফেলে তখন দুনিয়ার ভোগ বিলাসে বেশি থেকে বেশি লিপ্ত হতে চায়, ন্যায়-অন্যায়ের তোয়াক্কা করে না বলে এই সময় অনেকে লোভ-লালসা, সুদ-ঘুষ, মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, খুনখারাবি সহ নানা ধরণের দুর্নীতি-অপরাধের জালে জড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন,

لَتُبۡلَوُنَّ فِیۡۤ اَمۡوَالِکُمۡ وَ اَنۡفُسِکُمۡ

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের নিজ জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে (আলে ইমরান: ১৮৬)।

এই আয়াত থেকে জানা যায়, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে নেয়ামতরাজি দান করেছেন সেগুলো আমাদের জন্য এক একটি পরীক্ষা। এইসব পার্থিব জিনিসের মধ্যে আসক্ত হয়ে পড়লে পৃথিবীতে নানা রকম ফিতনা-ফাসাদ অবিরতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

২। বিভাজন ও সাম্প্রদায়িকতা: কুরআন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং অভ্যন্তরীণ বিবাদের ক্ষতির ব্যাপারে সতর্ক করে। যখন মুসলমানরা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ধর্ম, নেতৃত্ব বা পার্থিব লাভের বিষয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তখন এটি তাদের সম্মিলিত শক্তিকে দুর্বল করে দেয় এবং ফিতনার দরজা খুলে দেয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন মাজিদে উল্লেখ করেছেন,

وَ اعۡتَصِمُوۡا بِحَبۡلِ اللّٰهِ جَمِیۡعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوۡا

অর্থাৎ, আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না (আলে ইমরান: ১০৩)।

৩। শয়তানের ধোঁকা: শয়তানের প্রধান লক্ষ্য হল মানুষকে বিভ্রান্ত করা এবং দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। তার ওয়াসওয়াসা ও চাতুরীপূর্ণ কৌশলের মাধ্যমে সে মানুষকে বিপথগামী করে, মানুষের মনে সন্দেহের বীজ বপন করে এবং তাদেরকে পাপ কাজে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করে। বলা বাহুল্য, বর্তমান জামানায় মানুষের মধ্যে দ্বীনের জ্ঞান ও চর্চা হ্রাস পাওয়ার কারণে ঈমানি শক্তি অনেক কমে গেছে। ফলে মানুষ অতি অল্পতেই শয়তানের প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে ফেলে নানারকম ফিতনা-ফাসাদের জন্ম দেয়। পবিত্র কুরআনের নানা জায়গায় আল্লাহ তাআলা মানুষকে শয়তানের ধোঁকা থেকে সতর্ক করেছেন। শয়তানকে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে ঘোষণা করেছেন সুরা ফাতিরে,

اِنَّ الشَّیۡطٰنَ لَکُمۡ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوۡهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا یَدۡعُوۡا حِزۡبَهٗ لِیَکُوۡنُوۡا مِنۡ اَصۡحٰبِ السَّعِیۡرِ

অর্থ: "নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু হিসেবে গণ্য কর। সে তার দলকে কেবল এজন্যই ডাকে যাতে তারা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হয়।"(সুরা ফাতির: ৬)

৪। দ্বীনশিক্ষার প্রতি অবহেলা: প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ দ্বীনি ইলম অর্জন করাকে ফরজ করা হয়েছে। কেননা মানুষ যখন তাদের ধর্মীয় শিক্ষা, নীতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে পড়ে, তখন তাদের ফিতনাতে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। দ্বীনি ইলমের অভাব থেকে ভ্রান্ত ফিরকার প্রতি দুর্বলতা সৃষ্টি হতে পারে যা একটি মারাত্মক ফিতনা। সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর থাকতে গেলে প্রথম প্রয়োজন সহিহ ইলম, কিন্তু ইলম অর্জনের কাজে গাফলতি করলে বিচ্যুতি অবধারিত। তাই প্রথমত মানুষকে জ্ঞান অর্জনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। কেননা,

اِنَّ اللّٰهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِهِمۡ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে যা আছে তা পরিবর্তন না করে।"(সুরা রা'দ: ১১)

৫। নৈতিকতার অবক্ষয়: নৈতিকতার অবক্ষয় ফিতনা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। নৈতিকতার অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হলো ধনসম্পদ। কা'ব ইবনে আইয়াদ্ব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত,

إن لكل أُمَّة فتنة، وفِتنة أُمَّتي: المال

নিশ্চয় প্রত্যেক উম্মতের একটি ফিতনা রয়েছে। আমার উম্মতের ফিতনা হলো ধন-সম্পদ (তিরমিযি)।
নৈতিকতার অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হলো নারীর ফিতনা। আধুনিক যুগে নারীকে পণ্যের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে যত্রতত্র। নাটক, সিনেমা, বিজ্ঞাপন তথা এমন কোনো অনুষঙ্গ নেই যেখানে নারীকে জাহেলিয়াতের জামানার মতো করে ব্যবহার করা হচ্ছে না। এসব কারণে সমাজে অশ্লীলতা-বেহায়াপনা ইত্যাদির দ্রুত প্রসার ঘটছে। অথচ হাদিসে বহুবার নারীর ফিতনার ব্যাপারে কড়াকড়ি ভাষায় সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। যেমন:

উসামা বিন যায়দ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ من النِّسَاء

আমার (ইন্তেকালের) পরে আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য নারী অপেক্ষা অধিক ফিতনার শঙ্কা আর কিছুতেই রেখে যাইনি (বুখারী ৫০৯৬, মুসলিম ২৭৪০, তিরমিযী ২৭৮০, ইবনু মাজাহ ৩৯৯৮, সহীহাহ্ ২৭০১, সহীহ আল জামি' ৫৫৯৭)।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ

অর্থাৎ, দুনিয়া হল সুমিষ্ট ও শ্যামল। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তাতে খলীফা বানিয়েছেন, যাতে তিনি দেখে নেন যে, তোমরা কেমন আমল কর। অতএব তোমরা দুনিয়া ও নারীর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর জেনে রেখো যে, বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা যা ছিল, তা ছিল নারীকে কেন্দ্র করে (মুসলিম ২৭৪২, তিরমিযী ২১৯১, ইবনে মাজাহ ৪০০০)।

ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ

অকল্যাণ নিহিত রয়েছে নারী, বাড়ি ও ঘোড়াতে (গাড়িতে) (বুখারী ৫০৯৩, মুসলিম ২২২৫, নাসায়ী ৩৫৬৮, তিরমিযী ২৮২৪, আবূ দাঊদ ৩৯২২, আহমাদ ৬৪০৫, সহীহ আল জামি' ৩৭২৭)।

(বি. দ্র. এই হাদিস থেকে পাঠকদের ধোঁকা খাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এই হাদিসে বলা হয়েছে উপর্যুক্ত জিনিসগুলোতে অকল্যাণ নিহিত আছে, কিন্তু এই কথা বলা নেই যে এগুলোর মধ্যে কোনো কল্যাণ নিহিত নেই। ছুরিতে যেমন কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়ই নিহিত থাকতে পারে, এবং ব্যবহারকারীর প্রয়োগের উপর তা নির্ভর করে, নারী,বাড়ি ও ঘোড়ার ক্ষেত্রেও তেমন। এই হাদিসের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র অকল্যাণের ব্যাপারে সতর্ক করা, সেই কারণে কল্যাণের ব্যাপারটা এই হাদিসে আসেনি, বরং সেটার জন্য বহু পৃথক পৃথক হাদিস রয়েছে। যেমন: এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) জানিয়েছেন তাঁর প্রিয় তিনটি জিনিসের মধ্যে একটি হচ্ছে নারী। অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে, কেয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ভাগ্যে কল্যাণ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অন্য হাদিস থেকে বোঝা যায় বাসাবাড়ির মধ্যেও রহমতের ফেরেশতা চলাচল করে।)

হাদিসে বিধৃত হয়েছে যে নারীর জন্য মসজিদ অপেক্ষা উত্তম হচ্ছে নিজ গৃহে নামাজ আদায় করা। অথচ আজকালকার নারীরা ক্যারিয়ারের নামে, স্বাধীনতার নামে, সৌন্দর্যের নামে ঘর ছেড়ে বহির্মুখী। আল্লাহ তাআলা নারী ও পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন, ফলে এই আকর্ষণ এড়িয়ে নারী-পুরুষের সহাবস্থান সম্ভব নয়, তাতে ফিতনা অনিবার্য।

এই কারণে শরিয়তে বেগানা নারী-পুরুষের নির্জন সাক্ষাৎকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "কোন পুরুষ যেন কোন নারীর সাথে একান্তে গোপনে অবস্থান না করে। কারণ, শয়তান উভয়ের মধ্যে ওয়াসওয়াসাদানকারী হয় ((তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ: ৩১১৮)।

অনুরূপ কোন বেগানা মহিলার সাথে নির্জনে নামায পড়াও বৈধ নয় (জামিউ আহকামিন নিসা, মুস্তাফা আল আদাবী ১/৩৬০)।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

মহিলা যেন মাহরাম পুরুষ ছাড়া একাকি সফর না করে (বুখারী ৫২৩৩, মুসলিম ১৩৪১)।

মহানবী (ﷺ) আরো বলেন,

لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ.

''তোমরা সেই মহিলাদের নিকট গমন করো না যাদের স্বামীরা বিদেশে আছে। কারণ, শয়তান তোমাদের রক্তশিরায় প্রবাহিত হয়।'' *সহীহ তিরমিযী ৯৩৫নং, সহীহ ইবনে মাজাহ, আল্লামা আলবানী ১৭৭৯নং*

নবী (ﷺ) বলেন,

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً.

''প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী। আর রমণী যদি সুগন্ধি ব্যবহার করে কোন (পুরুষের) মজলিসের পাশ দিয়ে পার হয়ে যায় তাহলে সে এক বেশ্যা।'' *(সহীহ তিরমিযী, আল্লামা আলবানী ২২৩৭নং)*

আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেন,

﴿إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾

''যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পরপুরুষদের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরের মানুষ প্রলুব্ধ হয়।'' *(সূরা আল-আহযাব (৩৩) : ৩২)*

এই জন্যই ইমাম ভুল করলে পুরুষ মুক্তাদীরা তসবীহ বলে স্মরণ করাবে, আর মহিলারা হাততালির শব্দে, তসবীহ বলেও নয়! যাতে নারীর কণ্ঠস্বরে কতক পুরুষের মনে যৌনানুভূতি জাগ্রত না হয়ে উঠে। সুতরাং নারী-কণ্ঠের গান তথা অশ্লীল গান যে কি, তা রুচিশীল মানুষদের নিকট সহজে অনুমেয়।

সমাজ সংস্কারক নবী (ﷺ) বলেন,

لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ.

''কোন ব্যক্তির মাথায় লৌহ সুচ দ্বারা খোঁচা যাওয়া ভালো, তবুও যে নারী তার জন্য অবৈধ তাকে স্পর্শ করা ভালো নয়।''[17]

যেহেতু ''চক্ষুও ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার হল (কাম)দৃষ্টি।'' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৮৬নং)।*

আল্লাহ্ বলেনঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের গুপ্তাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য মঙ্গল আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত আছেন।" [সূরা আন- নূরঃ ৩০]

আল্লাহ্ বলেনঃ "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়।এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু"। [সূরা আল-আহজাবঃ ৫৯]

৬। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব: সমাজের উপর পরিবেশের প্রভাবের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমান বিশ্ব একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। যে কোনো একটি ফিতনা একস্থানে শুরু হলে তা মূহুর্তের মধ্যে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ব আজ ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত।যা কিছু ভালো, যা কিছু মন্দ, মানুষ অনলাইন ও সোসাল মিডিয়ার বদৌলতে তা বিনা বাছবিচারে শেয়ার করে, প্রচার করে। ফলে ভালো জিনিসের পাশাপাশি মন্দ জিনিসও দ্রুত গতিতে সমাজে বিস্তার লাভ করে। একটা সময় টেলিভিশনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছে মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে, কিন্তু বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে টেলিভিশন একটি প্রাচীন বস্তু, ইন্টারনেটের কল্যাণে ঘর কিংবা বাইরের ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে দেশে বিদেশে। নিজের হাতে থাকা মুঠোফোনের মাধ্যমে সেসব দৃশ্য মানুষ নিমেষেই দেখতে পাচ্ছে। এটি ছাড়াও পারিবারিক বন্ধন নড়বড়ে হয়ে যাওয়া, নারীদের ব্যাপকভাবে পরিবারে অমনোযোগ, ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রকাশ করা ইত্যাদি বিবিধ কারণে সমাজে দুষ্টু লোকের সংখ্যা বাড়ছে। ফলে সমাজ থেকে সৎ ও যোগ্য নেতা এমনভাবে বিদায় নিচ্ছে যে তা আর বলে দিতে হবে না
হাদিস শরিফে উল্লেখিত হয়েছে ,

إنما مَثَلُ الجَلِيسِ الصالحِ وجَلِيسِ السُّوءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ، ونَافِخِ الكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ: إما أَنْ يُحْذِيَكَ، وإما أَنْ تَبْتَاعَ منه، وإما أن تجد منه رِيحًا طيبةً، ونَافِخُ الكِيرِ: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رِيحًا مُنْتِنَةً

অর্থাৎ, সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হল, কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) ও হাপরে ফু দানকারী (কামারের) ন্যায়। কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তার কাছ থেকে তুমি কিছু খরিদ করবে অথবা তার কাছ থেকে সুবাস লাভ করবে। আর হাপরে ফু দানকারী (কামার) হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে (সহীহ বুখারীঃ ৫৫৩৫, সহীহ মুসলিমঃ ১৪৬)।

৭। ঈমানি দুর্বলতা ও তাকওয়া-হুব্বুল্লাহ এর অভাব: যখন বান্দার মন থেকে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা দূর হয়ে যায় তখন বান্দা যে কোনো গুনাহের প্রতি ঝুঁকে পড়তে পারে। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মজবুত ঈমান ও তাকওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে শুধু এসবই যথেষ্ট নয়, কেননা সময়ে সময়ে শয়তানের ধোঁকায় অথবা নফসের তাড়নায় ঈমানের হালত খারাপ থাকতে পারে বা তাকওয়ার বন্ধন ঢিলে হয়ে যেতে পারে, সেই সময় আল্লাহর প্রতি মহব্বত বান্দাকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো এই যে বর্তমান সময়ে মানুষ দুনিয়ার মোহে এত বেশি ব্যস্ত যে ঈমান-আমল চর্চা করার জন্য উপযুক্ত সময় ব্যয় করতে পারে না। ফলে তাকওয়া এবং হুব্বুল্লাহর অভ্যাস গড়ে ওঠে না, ঈমানও দুর্বল থাকে বলে সর্বদা নানারকম ফিতনা ফাসাদের মধ্যে পতিত হয় এবং বেশিরভাগ সময়ই সেগুলো থেকে উৎরে আসতে পারে না।

৮। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ কমে যাওয়া: সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব। মানুষ যখন এই দায়িত্ব পালনে অবহেলা দেখায় তখন পৃথিবীটা নানারকম ফেতনা-ফাসাদে ভরে ওঠে, আল্লাহ তাআলার গায়েবি আজাবে ভালো-মন্দ সবশ্রেণীর মানুষকেই কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়।

রাসুলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সঃ)কে বলতে শুনেছি, ,তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মন্দ কাজ সংঘটিত হতে দেখে সে যেন হাত দিয়ে বাধা দেয়। তাতে সমর্থ না হলে মুখ দিয়ে বাধা দেয়। তাতেও সমর্থ না হলে অন্তর থেকে ঘৃণা করে, এবং এটাই ঈমানের নিম্নস্তর (সহিহ মুসলিম-৪৯)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মত হিসেবে আমাদের কর্তব্য মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত হিসেবে ঘোষণার পরপরই এ কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই বোঝা যায় সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের জন্য এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ, অর্থাৎ, বিশেষভাবে এই কাজের জন্যই আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত বানিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ

অর্থাৎ, তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত,যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে (সুরা আল ইমরান : ১১০)।

এছাড়াও, যারা সৎ কাজের আদেশ করে না এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে না ইবনে আব্বাস (রা:) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে তাদেরকে তিনি তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত পর্যন্তও করেননি। তিনি বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না বড়দের সম্মান করে না, সৎকাজের নির্দেশ দেয় না এবং অসৎ কাজে বাধা দেয় না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (তিরমিজি: ১৯২১, মিশকাত: ৪৯৭০)

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সম্পর্কিত নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করা যাক,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ "

অর্থাৎ, মানুষ যদি কোনো অত্যাচারীকে অত্যাচারে লিপ্ত দেখেও তার দুহাত চেপে ধরে তাকে প্রতিহত না করে তা হলে আল্লাহ তায়ালা অতি শিগগিরই তাদের সবাইকে তার ব্যাপক শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত করবেন (তিরমিজি : ২১৬৮)।

তাই শুধু নিজে নেক আমল করতে থাকা যথেষ্ট নয়, বরং অন্যকেও নেক আমলের আদেশ দেওয়া এবং বদ আমলে নিষেধ করা তথা আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের চর্চা জারি রাখতে হবে। নতুবা আল্লাহ তাআলা বান্দার দোয়াও কবুল করবেন না মর্মে আরো একটি হাদিস এসেছে,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ "

হজরত হুজাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত- রাসুল (সা.) বলেন, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় তোমরা সৎ কাজের জন্য আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে। তা না হলে আল্লাহ তায়ালা অতি শিগগিরই তোমাদের ওপর তাঁর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তোমরা তখন তাঁর নিকট দোয়া করলেও তিনি তোমাদের সেই দোয়া কবুল করবেন না (তিরমিজি : ২১৬৯)।

৯। সুন্নাতের প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞা: মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে (সুরা আহজাব: ২১)।

তাহলে দেখা গেল, মহান আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে শিখিয়ে দিলেন দুনিয়ার জীবনে কাকে মডেল বা আদর্শ মানতে হবে। কিন্তু যেহেতু আজকাল এই সুন্নাতের ব্যত্যয় ঘটছে অর্থাৎ মানুষ নবীজির সুন্নাত আঁকড়ে ধরার বদলে আধুনিকতার অনুসরণের নামে বেদ্বীন সেলিব্রিটিদের আদর্শ অনুসরণ করছে এই কারণে আল্লাহর জমিন ফিতনা দ্বারা পরিপুরর্ণ হয়ে গেছে।
অথচ পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় রাসুলুল্লাহ (স:) কে অনুসরণের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন। যেমন:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

অর্থাৎ, আর রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। (সূরা হাশর ৭)

তিনি আরো বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى

অর্থাৎ, সে মনগড়া কথাও বলে না। তা তো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। (সূরা নাজম ৩-৪)

তিনি আরো বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

অর্থাৎ, বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। (সূরা আলে ইমরান: ৩১)

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদবিসংবাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়। *(সূরা নিসা : ৬৫)*
অন্য আয়াতে তিনি বলেছেন,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ قَالَ العلماء : معناه إِلَى الكتاب والسُنّة
অর্থাৎ, আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। (সূরা নিসা: ৫৯)

তিনি আরো বলেন,
مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ

অর্থাৎ, যে রসূলের আনুগত্য করল, সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করল (সূরা নিসা: ৮০)।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللهِ
অর্থাৎ, আর নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর—সেই আল্লাহর পথ। *(সূরা আশ-শুরা: ৫২)*
মহান আল্লাহ আরো বলেন,
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
অর্থাৎ, সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে (সূরা নূর: ৬৩)।

একইভাবে পবিত্র হাদিসগ্রন্থেও মহানবী (স:) এর সুন্নাত আঁকড়ে ধরার তাগিদ দেওয়া হয়েছে বিভিন্নভাবে। যেমন:

عَنْ أَبِي نَجِيحِ العِرباضِ بنِ سَارِيَةَ قَالَ : وَعَظَنَا رسولُ اللهِ ﷺ موعظةً بَلِيغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اختِلافاً كَثيراً فَعَلَيْكُمْ بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فإِنَّ كلَّ بدعة ضلالة رواه أَبُو داود والترمذي وَقالَ حديث حَسَنٌ صَحِيْحٌ

অর্থাৎ, আবূ নাজীহ ইরবায ইবনে সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনালেন যে, তাতে অন্তর ভীত হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে গেল। সুতরাং আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! এ যেন বিদায়ী ভাষণ মনে হচ্ছে। তাই আপনি আমাদেরকে অন্তিম উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, ''আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি এবং (রাষ্ট্রনেতার) কথা শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি; যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্রো (আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসী) রাষ্ট্রনেতা হয়। (স্মরণ রাখ) তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবূত করে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।
আর নাসাঈর এক বর্ণনায় আছে, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে নিয়ে যায় (আবু দাউদ: ৪৬০৯, তিরমিযী: ২৬৭৬, ইবনে মাজাহ :৪২)।

আবার, ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدخُلُونَ الجَنَّةَ إلاَّ مَنْ أَبَى قيلَ : وَمَنْ يَأبَى يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى رواه البخاري

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে যাবে; কিন্তু সে নয় যে অস্বীকার করবে। জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! (জান্নাতে যেতে আবার) কে অস্বীকার করবে?' তিনি

বললেন, যে আমার অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে যাবে এবং যে আমার অবাধ্যতা করবে, সেই জান্নাত যেতে অস্বীকার করবে (বুখারী:৭২৮০)।

অথচ, দেখা যায় হাদিসের ভাষ্যমতে যেখানে রাসুলুল্লাহ (স:) এর অনুসরণ করা-না করার উপর জান্নাত-জাহান্নাম নির্ভরশীল সেখানে একশ্রেণির মানুষ কোনো সুন্নাত লঙ্ঘনই করে এটি মনে করে যে—এটা তো সুন্নাত নয়, করলে নেকি, না করলে গুনাহ নেই। কাজেই এটা ত্যাগ করা যায়!

আফসোস, এই সমস্ত কারণে মুসলমানদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, মুসলমানদের অবস্থান পার্থিব সকল ক্ষেত্রে কাফিরদের চেয়ে খারাপ হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ইবাদতের নামে বিদআত, আর আধুনিকতার নামে সুন্নাত বর্জনের প্রতিযোগিতার ফলে মুসলমানের জীবনে প্রতিনিয়ত ধেয়ে আসছে নানা বালা-মুসিবত, পৃথিবী ভরে যাচ্ছে উপর্যুপরি ফিতনা-ফাসাদে। যেমন ধরা যাক, আকীদাগত ফিতনা হিসেবে মুনকিরিনে হাদিসদের কথা, তারা যদি রাসুলুল্লাহ (স:)কে অনুসরণের ব্যাপারে কুরআনের এই সমস্ত নির্দেশ একবাক্যে মেনে নিত তাহলে এই ফিরকাটির উদ্ভব হত না। আবার হাদিসে আছে নারী-পুরুষের জীবনযাপন, বেশভূষা, পারস্পরিক চলাফেরা, পর্দা-পুশিদা কেমন হবে। যদি হাদিস মোতাবেক মানুষ জীবনযাপন করত তাহলে সমাজে এত বিশৃঙ্খলা, হানাহানি, ব্যভিচার, ডাস্টবিনে ভ্রূণ পাওয়া ইত্যাদি ঘটনা ঘটত না। উপরন্তু মুসলমান যদি তাদের চলাফেরা, মোয়ামেলা, মোয়াশেরা, আখলাক ইত্যাদি সবকিছুতে সুন্নাত মেনে চলত তাহলে আশা ছিল যে কাফেররা তা দেখে ইসলাম কবুল করে ফেলত। ফলে অমুসলিমদের থেকে আগত নানাবিধ ফিতনা পৃথিবীকে দেখতেই হত না।
কাজেই, বলা যায় যে সুন্নাতের প্রতি অবহেলা পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।

১০। মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ঢিলে হয়ে যাওয়া: পবিত্র কুরআন মাজিদে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ اِخۡوَۃٌ فَاَصۡلِحُوۡا بَیۡنَ اَخَوَیۡکُمۡ وَ اتَّقُوا اللّٰہَ لَعَلَّکُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ

নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে (সুরা হুজুরাত: ১০)।

এছাড়াও তিনি অন্যত্র বলেন,

وَ اعۡتَصِمُوۡا بِحَبۡلِ اللّٰہِ جَمِیۡعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوۡا ۪ وَ اذۡکُرُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰہِ عَلَیۡکُمۡ اِذۡ کُنۡتُمۡ اَعۡدَآءً فَاَلَّفَ بَیۡنَ قُلُوۡبِکُمۡ فَاَصۡبَحۡتُمۡ بِنِعۡمَتِہٖۤ اِخۡوَانًا ۚ وَ کُنۡتُمۡ عَلٰی شَفَا حُفۡرَۃٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنۡقَذَکُمۡ مِّنۡہَا ؕ کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰہُ لَکُمۡ اٰیٰتِہٖ لَعَلَّکُمۡ تَہۡتَدُوۡنَ
অর্থাৎ, আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেল। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বয়ান করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও (সুরা আলে ইমরান: ১০৩)।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم:13]، وَمُسْلِمٌ [رق
অর্থাৎ, তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে (ইমাম নববীকৃত ৪০টি হাদিস: ১৩)।

এছাড়াও বর্ণিত হয়েছে,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

অর্থাৎ, রাসুলুল্লাহ (স:) বলেন, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। কাজেই কারো জন্য উচিত নয় অন্যের উপর জুলুম করা, অথবা তাকে কোনো জালিমের কাছে সোপর্দ করা। যে তার মুসলমান ভাইয়ের কোনো হাজত পূরণ করবে আল্লাহ তাআলা তার হাজত পূরণ করবেন। যে কেউ তার মুসলমান ভাইয়ের অসুবিধা দূর করবে, আল্লাহ তাআলা হাশরের দিনে তাঁর অসুবিধা দূর

করবেন। আর যে একজন মুসলিমের ইজ্জত রক্ষা করবে আল্লাহ তাআলা বিচারের দিনে তার ইজ্জত রক্ষা করবেন (সহিহ বুখারি: ২৪৪২)।

এছাড়াও বর্ণিত হয়েছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى "

পারস্পরিক ভালবাসা, স্নেহ, সহানুভূতির ক্ষেত্রে বিশ্বাসীদের উপমা তো একটি দেহের মতো; যখন তাদের কোনো অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তখন সমস্ত দেহই সমানভাবে আক্রান্ত হয় এবং সারা শরীরেই জ্বর-ব্যাথা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয় (সহিহ মুসলিম: ২৫৮৬)।
অতএব, উপর্যুক্ত হাদিসগুলো থেকে অনুমান করা যায় ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধের গুরুত্ব কতটুকু। কিন্তু মুসলমান দিন দিন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়ার কারণে ভ্রার্তৃত্ববোধের বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ, আন্তঃকলহ, হানাহানি, কুৎসা রটনা, অপমান-অপদস্তকরণ সহ বিভিন্ন ধরণের ফিতনার বিস্তার ঘটেছে।

১১। আত্মশুদ্ধির প্রতি অনীহা: এসলাহ বা আত্মশুদ্ধির প্রতি বর্তমান যামানার সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, সাধারণত আলেমদের অনীহাই দেখার মতো। আত্মশুদ্ধিকে বর্তমানে তেমন কাজের জিনিস হিসেবে গণ্য করা হয় না। অথচ, মানুষের ফরজ-নফল সব ধরণের ইবাদত কবুল হওয়া-না হওয়ার বিষয়টি আত্মশুদ্ধির সাথে জড়িত। হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، وَأَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَالصَّلاَةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ "

অর্থাৎ, রাসূল (সা:) বলেছেন : তোমরা হিংসা হতে বিরত থাক। কেননা হিংসা মানুষের সৎকর্মগুলোকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেমনিভাবে আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২১০)।

আবার অহঙ্কার সম্পর্কে হাদিসে এসেছে,
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ "

অর্থাৎ, যার অন্তরে এক যাররা (অণু) পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৫৯)।

হিংসা, অহঙ্কার এর পাশাপাশি দুনিয়াপ্রীতি, লোভ, পদমোহ ইত্যাদি আরো বেশকিছু পশুবৃত্তি আছে যেগুলো মানুষের মন থেকে তাযকিয়া করে বের করতে হয় এবং এর পাশাপাশি আল্লাহভীতি, অল্পেতুষ্টি, দুনিয়াবিমুখতা, ধৈর্য, আল্লাহনির্ভরতা ইত্যাদি বেশ কিছু গুণ মানুষের অন্তরের মধ্যে ঢোকানোর প্রয়োজন হয়। নতুবা, প্রচুর আমল করার পর উপর্যুক্ত বদ আমলগুলোর যে কোনো একটা থাকার কারণে কারো আখিরাত বরবাদ হয়ে যেতে পারে। এই ব্যাপারে মহানবী (স:) ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ

জেনে রেখ, মানুষের দেহের মধ্যে এক খন্ড মাংশ পিন্ড আছে, যখন তাহা সংশোধিত হয়, তখন সমগ্র দেহ সংশোধিত হয়ে যায়। আর যখন তা দুষিত হয় তখন সমগ্র দেহটাইত দুষিত হয়ে যায়। মনে রেখ ওটাই ক্বলব (সহিহ মুসলিম: ১৫৯৯)।

মানুষ নামাজ, রোজার মতো জাহেরি আমলের প্রতি যতটা ধাবিত হয়, আত্মশুদ্ধির মতো বাতেনি আমলের প্রতি ততটা ধাবিত হয় না। এসব কারণে সকল ফরজের বড় ফরজ হওয়ার সত্ত্বেও আত্মশুদ্ধির বিষয়টি বর্তমান যামানায় অবহেলিত থেকে গেছে। ফলে মানুষ বাহ্যিকভাবে নেক আমল করলেও প্রকৃতপক্ষে রুহানিয়াত হাসিল না হওয়ার কারণে পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, অহঙ্কার, পদমর্যাদার লোভে অপরের ক্ষতি করা, মিথ্যা, অপবাদ, গীবত, চোগলখুরি ইত্যাদি আত্মিক রোগে জর্জরিত অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। কাজেই বলা যায়, আত্মশুদ্ধির প্রতি অনীহা উপর্যুক্ত ফিতনাগুলো বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।

১২। মৃত্যুর স্মরণ কম হওয়া: পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

كُلُّ نَفۡسٍ ذَآئِقَۃُ الۡمَوۡتِ ؕ وَ اِنَّمَا تُوَفَّوۡنَ اُجُوۡرَکُمۡ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ ؕ فَمَنۡ زُحۡزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدۡخِلَ الۡجَنَّۃَ فَقَدۡ فَازَ ؕ وَ مَا الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الۡغُرُوۡرِ

অর্থাৎ, প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর ‘অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী (আলে ইমরান: ১৮৫)

কিন্তু মানুষ যেন তা ভুলতে বসেছে। যুবক বয়সে মানুষ ভাবে, বয়সের আরো অনেক বাকি আছে, এখন কিছুটা খেলতামাশা করাই যায়। এভাবে দিন চলতে থাকে এবং একপর্যায়ে গিয়ে এই খেলতামাশা থেকে মানুষ বের তো হয়ে আসতেই পারে না, উপরন্তু মুজাদ্দিদে জামান হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ:) এর মতে, মানুষের যত বয়স হয় তত দুনিয়াপ্রীতি বাড়তে থাকে। এমনও হয় যে শানশওকতপূর্ণ মজাদার দুনিয়ার সাথে মৃত্যুর মাধ্যমে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে ভেবে অনেকে মৃত্যুর স্রষ্টা আল্লাহকেই শত্রুর নজরে দেখতে থাকে।
মৃত্যুর স্মরণ কমে গেলেই মানুষ পাপ কাজে প্রবৃত্ত হয়। যদি ঘুষ খাওয়ার সময়, সুদ খাওয়ার সময়, জেনা করার সময় মানুষের এই স্মরণ থাকত যে একদিন এই দুনিয়া থেকে ঠিকই চলে যেতে হবে, কবরের গহীন অন্ধকারে তার দেহটা পোকামাকড়ে কুরে কুরে খাবে তাহলে অবশ্যই মৃত্যুর ভয়ে মানুষের চোখে পাপের মজা পানসে হয়ে যেত। কাজেই দুনিয়াতে এই যে মানুষের সদম্ভে যাচ্ছেতাই চলাফেরা, পাপ-পঙ্কিল জীবনযাপন, ফিতনার সাগরে নিরন্তর নিমজ্জিত থাকা—এসবের পেছনে আরো একটি প্রধান কারণ হলো মৃত্যুর স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া।

১৩। দুর্নীতিগ্রস্থ নেতৃত্ব ও কতৃত্ব : নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বরাবরই একটি গুরুদায়িত্ব, এক প্রকার চ্যালেঞ্জ। নেতৃত্ব ইসলামে কতটা চ্যালেঞ্জিং হিসেবে দেখা হয় তা বোঝা যায় মহান আল্লাহ তাআলার তাঁর নবী হযরত দাউদ (আ:) এর প্রতি কঠোর নির্দেশে থেকে,

یٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلۡنٰکَ خَلِیۡفَۃً فِی الۡاَرۡضِ فَاحۡکُمۡ بَیۡنَ النَّاسِ بِالۡحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الۡهَوٰی فَیُضِلَّکَ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِیۡنَ یَضِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ لَهُمۡ عَذَابٌ شَدِیۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا یَوۡمَ الۡحِسَابِ

(হে দাউদ), নিশ্চয় আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি, অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল (সুরা সোয়াদ: ২৬)।

একজন নবীকে যদি আল্লাহ তাআলা নেতৃত্বের ব্যাপারে এতটা সতর্ক করেন তাহলে একজন সাধারণ মানুষের আরো কতটা সতর্কতা কাম্য তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আজকাল নেতৃত্বের বিষয়টি ছেলের হাতের মোয়ায় পরিণত হয়েছে। খাইরুল কুরুনের জামানায় কোনো সাহাবি আমির হতে ভয় পেতেন, অথচ বর্তমান জামানায় আমির হওয়ার জন্য মানুষ নির্বাচনে দাঁড়ায়, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে যে কোনো কাজ করতে বিবেকে বাধে না। এখানেই শেষ নয়, নেতৃত্ব পাওয়ার পর নেতৃত্বের অপব্যবহার করা একটি মামুলি বিষয়। দুর্নীতি, লুটপাট, স্বজনপ্রীতি, অত্যাচার-দমন ইত্যাদি ফিতনা-ফাসাদগুলোর জন্মই হয়েছে নেতৃত্বের অপব্যবহার তথা দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্ব থেকে।
নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের স্পর্শকাতরতার বিষয়টি অনুধাবনের সুবিধার্থে নিচের হাদিসটি উল্লেখ করা সমীচিন হবে:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"

অর্থাৎ, ইসমাঈল (রহঃ) ... আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোন ব্যাক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল; সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখ, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে (সহিহ বুখারি: ৭১৩৮)।

১৪। তাওয়াক্কুলের অভাব: পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَ اَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۬ؕ وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ
وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনে এটি দ্বারা তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন (সুরা তালাক: ২-৩)।

তাওয়াক্কুল সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার বয়ান যখন এরূপ তখন এই সময়ের বেশিরভাগ সাধারণ মানুষের অবস্থা এর বিপরীত। মানুষের মধ্যে আজ তাওয়াক্কুল চর্চার বড়ই অভাব। আছে তবু আরো চাই, যেন মানুষ অনন্তকাল বাঁচবে। ইমাম গাজ্জালি (রহ:) বলেন, এক বছরের অধিক সময়ের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী। অথচ আমাদের সমাজে মানুষ কয়েক প্রজন্ম যেন পায়ের ওপর পা তুলে খেতে পারে এই আশায় আল্লাহর নাফরমানি করে ধন-সম্পদ কামাই করতে চায়। যদিও কথায় আছে, কারো ধনই তিন পুরুষের বেশি যায় না, বাস্তবেও কথাটির সত্যতা উপলব্ধি করা যায়, তাসত্ত্বেও মানুষ দারিদ্রের ভয়ে না যতটা তারচেয়ে বেশি অনন্তকালব্যাপী নিরাপদে বেঁচে থাকার অসম্ভব আশায় ফিতনায় জালে জড়িয়ে যায়। চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন, মাপে কম দেওয়া, মালে ভেজাল দেওয়া, ঘুষ, সুদ প্রভৃতি নানারকম ফিতনা শুধু মাত্র তাওয়াক্কুলের অভাবের কারণেই দেখা দেয়।

১৫। সবরের অভাব: তাওয়াক্কুলের অভাবের সাথে সম্পর্কিত আরো একটি বিষয় হলো সবরের অভাব। অল্প সময়ে অধিক মুনাফা করার জন্য মানুষ খাদ্য মজুদ করে, তাৎক্ষণিক বিচার পাওয়ার জন্য আইন নিজের হাতে তুলে নেয়, নিজের স্বার্থের সামান্য হানি হলে বা নিজের মানসম্মানে সামান্য আঁচড় লাগলে মানুষ এই যে সাথে সাথে প্রতিশোধ নিয়ে নেয় এসবের মূল কারণ হচ্ছে সবরের মতো একটি মহৎগুণের অভাব। অথচ, ইসলামের মনীষীরা বলেন, দ্বীনের ৮০%ই সবর। সবরের ফাজায়েল মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন মাজিদে ঘোষণা করেছেন এভাবে,

وَ اصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

অর্থাৎ, আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন (সুরা আনফাল: ৪৬)।

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِیْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ؕ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, বল, "হে আমার মুমিন বান্দারা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়ায় ভাল কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত, কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোন হিসাব ছাড়াই।"(সুরা জুমার: ১০)।

এছাড়াও মহানবী (স:) বলেছেন, ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত (মিশকাত)।

১৬। মাশওয়ারা করে কাজ না করা: মাশওয়ারা করে কাজ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। ক্ষেত্রবিশেষে তা সুন্নাত, ক্ষেত্রবিশেষে তা ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়। মাশওয়ারার গুরুত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বিধৃত হয়েছে,

وَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

অর্থাৎ, আর যারা তাদের রবের আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, তাদের কার্যাবলী তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে (সুরা শু'রা: ৩৮)।

পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায়, হযরত সুলাইমান (আ:) এর স্ত্রী বিলকিসের অভ্যাস ছিল, সভাসদদের সাথে মাশওয়ারা করে কাজ করা। হয়ত এই কারণেই তিনি সাবার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হতে পেরেছিলেন। তাঁর ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য এরকম—

قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِیْ فِیْۤ اَمْرِیْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ

সে (রাণী) বলল, 'হে পারিষদবর্গ, তোমরা আমার ব্যাপারে আমাকে অভিমত দাও। তোমাদের উপস্থিতি ছাড়া আমি কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না (সুরা নামাল: ৩২)।

এর বিপরীতে ফেরাউনের উক্তি ছিল ঔদ্ধত্যে পরিপূর্ণ,

قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَ مَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ

ফির‘আউন বলল, ‘যা আমি সঠিক মনে করি তা-ই আমি তোমাদেরকে দেখাই আর আমি তোমাদেরকে কেবল সঠিক পথই দেখাই’ (সুরা গাফির: ২৯)।

প্রত্যেকেই অবগত আছেন যে এদের মধ্যে কে হেদায়তের পথে এসেছিল আর কে গোমরাহির পথে ধ্বংস হয়েছে। এই থেকে মাশওয়ারার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। কিন্তু বর্তমানে মানুষ এক মনচাহি জিন্দেগী যাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কারো কাছে মানুষ বাধা থাকতে চায় না, ধরা থাকতে চায় না। যখন যা তার মনে আসবে তখন তা করে ফেলতে চায়। অর্থাৎ, নফসের খেয়ালখুশিমতো চলতে চায় বলে মানুষের কাজকর্মের মধ্যে থেকেও বরকত কমে গেছে। শুধু তাই নয়, নেতা যখন নিজের খুশি মতো কাজ করেন তখন তাতে কোনো অমঙ্গল হলে কর্মীরা তাতে ক্ষুব্ধ হন, অনেক সময় এরকম ছোটখাট ঘটনা থেকে একটা ঐক্যবদ্ধ দল বা শ্রেণির মধ্যে ভাঙন ধরে। মাশওয়ারা করে কাজ করলে এই সমস্যাগুলোর মুখোমুখী হতে হত না। কাজেই বলা যায়, পারস্পরিক কোন্দল, বিদ্বেষ ইত্যাদি ফিতনাগুলোর জন্য মাশওয়ারার অভাব দায়ী।(মুসলিম ৭৪২৯,, মিশকাত ৫৩৮৪)

ফিতনার রোধে করণীয়: ১। প্রথমত উপরে উল্লেখিত ফিতনাগুলোর কারণ প্রতিটি ফিতনার বিবরণের সাথেই উল্লেখ করে দেওয়া রয়েছে। প্রতিটি ফিতনা যে কারণে উদ্ভব হচ্ছে তার বিপরীত কাজটাই উক্ত ফিতনা রোধে করণীয়। যেমন: মাশওয়ারার অভাবে যে ফিতনা হচ্ছে সেই ফিতনা রোধে বেশি করে মাশোয়ারা করতে হবে।

২। এছাড়াও এখন আর আমাদের অন্যের দোষ তালাশ করার সময় নেই। এখন উচিত নিজেদের সংশোধন করা। গুনাহ থেকে বিরত থাকা। সর্বদা আল্লাহর দরবারে তাওবা-ইসতেগফার করা। সকল ফিতনা থেকে বেঁচে থাকতে মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা। ফিতনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রিয় নবী (সা.) স্বীয় উম্মতদের এমন একটি দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন, উচ্চারণ : ‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল ফিতানি, মা জহারা মিনহা ওয়া মা বাতানা।’ অর্থ : ‘হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল ফিতনা থেকে পরিত্রাণ চাই।’ (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৭৭৮)

৩। ফিতনা থেকে বাঁচতে আমাদের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হলো, চোখের গুনাহ, অশ্লীলতা ও উলঙ্গপনা, অন্যকে কষ্ট দেওয়া, অন্যের হক নষ্ট করা, সুদ ও ঘুষের গুনাহ থেকে নিজেকে যথাসাধ্য বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। এ ধরনের অপরাধের ব্যাপারে সর্বদা নিজ পরিবার-পরিজন ও বন্ধু মহলকে সতর্ক করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই ভয়াবহ ফিতনাগুলো থেকে মুক্ত থাকার তাওফিক দান করুক। আমিন।

ফিতনা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ:

নিচে ফিতনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের জন্য কিছু হাদিস উল্লেখ করা হলো:

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رسول الله ﷺ تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَىُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَىُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ

অর্থাৎ, হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের হৃদয়ে চাটাইয়ের পাতা (বা ছিলকার) মত একটির পর একটি করে ক্রমান্বয়ে ফিতনা প্রাদুর্ভূত হবে। সুতরাং যে হৃদয়ে সে ফিতনা সঞ্চারিত হবে সে হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে এবং যে হৃদয় তার নিন্দা ও প্রতিবাদ করবে সে হৃদয়ে একটি সাদা দাগ অঙ্কিত হবে। পরিশেষে (সকল মানুষের) হৃদয়গুলি দুই শ্রেণীর হৃদয়ে পরিণত হবে। প্রথম শ্রেণীর হৃদয় হবে মসৃণ পাথরের ন্যায় সাদা; এমন হৃদয় আকাশ-পৃথিবী অবশিষ্ট থাকা অবধি-কাল পর্যন্ত কোন ফিতনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর হৃদয় হবে উবুড় করা কলসীর মত ছাই রঙের; এমন হৃদয় তার সঞ্চারিত ধারণা ছাড়া কোন ভালোকে ভালো বলে জানবে না এবং মন্দকে মন্দ মনে করবে না (তার প্রতিবাদও করবে না)। (মুসলিম ৩৮৬)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رسول الله ﷺ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ

অর্থাৎ, আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মাঝে যে যুগ আসবে তার চেয়ে তার পরবর্তী যুগ হবে অধিকতর মন্দ। আর এইভাবে মন্দ হতে হতে প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময় এসে উপস্থিত হয়ে পড়বে। (আহমাদ ১২৩৪৭, বুখারী ৭০৬৮, তিরমিযী ২২০৬, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৭৫৭৬)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ

অর্থাৎ, আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের নিকট এমন ধোকাব্যঞ্জক যুগ আসবে, যাতে মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদীরূপে এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদীরূপে পরিগণিত করা হবে। যখন খেয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে এবং আমানতদার আমানতে খেয়ানত করবে। যখন জনসাধারণের ব্যাপারে তুচ্ছ লোক মুখ চালাবে। (আহমাদ ৭৯১২, ইবনে মাজাহ ৪০৩৬, হাকেম ৮৪৩৯, সহীহুল জামে' ৩৬৫০)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِى قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

অর্থাৎ, সাওবান (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অনতিদূরে সকল বিজাতি তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে, যেমন ভোজনকারীরা ভোজপাত্রের উপর একত্রিত হয়। (এবং চারদিক থেকে ভোজন করে থাকে।) একজন বলল, 'আমরা কি তখন সংখ্যায় কম থাকব, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে তরঙ্গতাড়িত আবর্জনার ন্যায় (শক্তিহীন, মূল্যহীন)। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের বক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি ভীতি তুলে নেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে দুর্বলতা সঞ্চার করবেন। একজন বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! দুর্বলতা কী?' তিনি বললেন, দুনিয়াকে ভালোবাসা এবং মরতে না চাওয়া। (আবূ দাউদ ৪২৯৯, মুসনাদে আহমাদ ২২৩৯৭)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى وَالْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً فَلْيَعُذْ بِهِ

অর্থাৎ, আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ভবিষ্যতে বহু ফিতনা দেখা দেবে। যাতে উপবেশনকারী ব্যক্তি দণ্ডায়মান অপেক্ষা উত্তম হবে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি বিচরণকারী অপেক্ষা উত্তম হবে এবং বিচরণকারী ব্যক্তি ধাবমান অপেক্ষা উত্তম হবে। নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত অপেক্ষা উত্তম হবে এবং জাগ্রত ব্যক্তি দণ্ডায়মান অপেক্ষা উত্তম হবে। যে ব্যক্তি তার প্রতি উঁকি দিয়ে দেখবে, সে (ফিতনা) তাকে গ্রাস করে ফেলবে। অতএব যে কেউ সে সময় কোন আশ্রয়স্থল পায়, সে যেন সেখানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الْغَنَمُ فِيهِ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ أَوْ سَعَفَ الْجِبَالِ فِي مَوَاقِعِ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ

অর্থাৎ, আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ আসছে, যখন মুসলিমের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ হবে ভেঁড়া-ছাগল; তাই নিয়ে পর্বত-শিখরে ও পানির জায়গাতে চলে যাবে; ফিতনা থেকে নিজ দ্বীন নিয়ে পলায়ন করবে। (বুখারী ৩৬০০)

عن أهبان قَالَ قَالَ رسول الله ﷺ سَتَكُونُ فِتَنٌ وَفُرْقَةٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاكْسِرْ سَيْفَكَ وَاتَّخِذْ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ

অর্থাৎ, উহবান (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ভবিষ্যতে ফিতনা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দেবে। সুতরাং সে সময় এলে তুমি তোমার তরবারি ভেঙ্গে ফেলো এবং কাষ্ঠের তরবারি বানিয়ে নিয়ো। (আহমাদ ২০৬৭১)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رسول الله ﷺ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ

অর্থাৎ, আবূ যার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফিতনার সময় যদি তুমি ভয় কর যে, তরবারির চমক তোমার চোখ ঝলসে দেবে, তাহলে তুমি তোমার চেহারা আবৃত করে নাও। (আহমাদ ২১৪৪৫, আবূ দাঊদ ৪২৬৩, ইবনে মাজাহ ৩৯৫৮)

عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا خَالِدُ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَحْدَاثٌ وَفِتَنٌ وَاخْتِلَافٌ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ لَا الْقَاتِلَ فَافْعَلْ فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَاكَ فَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْقَاتِلَ

অর্থাৎ, খালেদ বিন উরফুত্বাহ (রাঃ) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে খালেদ! আমার পরে বহু অঘটন, ফিতনা ও মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। সুতরাং তুমি পারলে সে সময় আল্লাহর নিহত বান্দা হও এবং হত্যাকারী হয়ো না। (আহমাদ ২২৪৯৯, হাকেম ৮৫৭৮, ত্বাবরানী ১৭০৩, আবূ য়্যা'লা ১৫২৩)

عَنْ حُذَيْفَةَ بن اليمان قال: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ

অর্থাৎ, হুযাইফাহ বিন য়্যামান (রাঃ) বলেন, লোকেরা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ইষ্ট ও মঙ্গল বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত, আর আমি ভুক্তভোগী হওয়ার আশঙ্কায় অনিষ্ট ও অমঙ্গল বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতাম। একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা মূর্খতা ও অমঙ্গলে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে এই মঙ্গল দান করলেন। কিন্তু এই মঙ্গলের পর আর অমঙ্গল আছে কি?' তিনি বললেন, ''হ্যাঁ আছে।'' আমি বললাম, 'অতঃপর ঐ অমঙ্গলের পর আর মঙ্গল আছে কি?' তিনি বললেন, ''হ্যাঁ, আর তা হবে ধোঁয়াটে।'' (অর্থাৎ, বিশুদ্ধ ও খাঁটি মঙ্গল থাকবে না। বরং তার সাথে অমঙ্গল, বিঘ্ন, মতানৈক্য এবং চিত্ত-বিকৃতির ধোঁয়াটে পরিবেশ থাকবে।) আমি বললাম, 'তার মধ্যে ধোঁয়াটা কি?' তিনি বললেন, ''এক সম্প্রদায় হবে, যারা আমার সুন্নাহ (তরীকা) ছাড়া অন্যের সুন্নাহ (তরীকা) অনুসরণ করবে এবং আমার হেদায়াত (পথনির্দেশ) ছাড়াই (মানুষকে) পথপ্রদর্শন করবে। যাদের কিছু কাজকে চিনতে পারবে (ও ভালো জানবে) এবং কিছু কাজকে অদ্ভূত (ও মন্দ) জানবে।''
আমি বললাম, 'ঐ মঙ্গলের পর আর অমঙ্গল আছে কি?' তিনি বললেন, ''হ্যাঁ, (সে যুগে) জাহান্নামের দরজাসমূহে দণ্ডায়মান আহবানকারী (আহবান করবে)। যে ব্যক্তি তাদের আহবানে সাড়া দেবে, তাকে তারা ওর মধ্যে নিক্ষিপ্ত করবে।'' আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে তাদের পরিচয় বলে দিন।' তিনি বললেন, ''তারা আমাদেরই চর্মের (স্বজাতি) হবে এবং আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে।'' আমি বললাম, 'আমাকে কি আদেশ করেন -যদি আমি সে সময় পাই?' তিনি বললেন, ''মুসলিমদের জামাআত ও ইমাম (নেতা)র পক্ষাবলম্বন করবে।'' আমি বললাম, 'কিন্তু যদি ওদের জামাআত ও ইমাম না থাকে?' তিনি বললেন, ঐ সমস্ত দল থেকে দূরে থাকবে; যদিও তোমাকে কোন গাছের শিকড় কামড়ে থাকতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার ঐ অবস্থাতেই মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়েছে। (বুখারী ৩৬০৬, ৭০৮৪, মুসলিম ৪৮৯০, মিশকাত ৫৩৮২)

عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسٌ مَنْ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا، أَوْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ، أَوْ خَرَجَ غَازِيًا، أَوْ دَخَلَ عَلَى إِمَامِهِ يُرِيدُ تَعْزِيزَهُ وَتَوْقِيرَهُ، أَوْ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ فَسَلِمَ النَّاسُ مِنْهُ وَسَلِمَ مِنَ النَّاسِ

অর্থাৎ, মুআয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি পাঁচটির একটি পালন করবে সে আল্লাহর যামানতে হবে; কোন রোগীর সাথে সাক্ষাৎ করে তার অবস্থা জানবে, অথবা জিহাদে প্রস্থান করবে, কিংবা তার ইমাম বা নেতার নিকট তার শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আগমন করবে, অথবা (প্রকাশ্য কুফরী শুরু না হলে ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা বিদ্রোহ ঘোষণা না করে) স্বগৃহে উপবেশন করবে যাতে তার বাকশক্তি ও অন্যান্য শক্তি হতে জনগণ এবং জনগণের বিভিন্ন অত্যাচার হতে সে নিরাপদে থাকবে। (আহমাদ ২২০৯৩, ত্বাবারানী ১৬৪৮৫, সঃ জামে' ৩২৫৩)

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَامَةُ الرَّجُلِ فِي الْفِتْنَةِ أَنْ يَلْزَمَ بَيْتَهُ

অর্থাৎ, আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফিতনার সময় মানুষের নিরাপত্তার উপায় তার স্বগৃহে অবস্থান। (দাইলামী, সহীহুল জামে' ৩৬৪৯)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وِعاءَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ

অর্থাৎ, আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, 'আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে দু'টি (জ্ঞান) পাত্র সংরক্ষণ করেছি। যার একটি তো আমি প্রচার করে দিয়েছি। কিন্তু ওর দ্বিতীয়টি যদি প্রচার করতাম, তাহলে আমার এই কণ্ঠনালী কাটা যেত। (বুখারী ১২০)

عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لها النَّبِيُّ ﷺ يَا عَائِشَةُ لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ

অর্থাৎ, আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, তোমার কওম যদি কুফরীর নিকটবর্তী যুগের (নও-মুসলিম) না হত, তাহলে অবশ্যই আমি কা'বা ঘরকে ভেঙ্গে ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তি অনুসারে পুনর্নির্মাণ করতাম এবং তার জন্য দু'টি দরজা বানাতাম। একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করত ও অন্যটি দিয়ে বের হতো। (বুখারী ১২৬, মুসলিম ৩৩০৮, আহমাদ, নাসাঈ)

عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُولُ أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

অর্থাৎ, ইবনে উমার (রাঃ) শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ব দিকে মুখ ক'রে বলেছেন, সাবধান! ওখানে আছে ফিতনা, ওখানে আছে ফিতনা, যেখান হতে শয়তানের শিং উদয় হবে। (বুখারী ৭০৯২, মুসলিম ৭৪৭৬)

وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَيْفَ بِكُمْ إِذَا لَبِستكُمْ فِتْنَةٌ يَرْبُو فِيْهَا الصَّغِيْرُ وَ يُهْرِمُ فِيْهَا الكَبِيْرُ وَتَتَخِذُ سُنَّةً فَإِنَّ غَيَّرَتْ يَوْمًا قِيْلَ هَذَا مُنْكَرٌ قِيْلَ : وَمَتَى ذَلِكَ ؟ قَالَ إِذَا قِلَّتْ أَمْنَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ وَقِلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ وَتَفَقَّهُ لِغَيْرِ الدِّيْنِ وَالتَّمَسَّتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ

অর্থাৎ, ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'তোমাদের তখন কী অবস্থা হবে, যখন তোমাদেরকে ফিতনা-ফাসাদ গ্রাস করে ফেলবে? যাতে শিশু প্রতিপালিত (বড়) হবে এবং বড় বৃদ্ধ হবে, (তা সকলের অভ্যাসে পরিণত হবে) আর তাকে সুন্নাহ (দ্বীনের তরীকা) মনে করা হবে। পরন্তু তার যদি কোনদিন পরিবর্তন সাধন করা হয় তাহলে লোকেরা বলবে, 'এ কাজ গর্হিত!'
তাঁকে প্রশ্ন করা হল, '(হে ইবনে মাসঊদ!) এমনটি কখন ঘটবে?' তিনি বললেন, 'যখন তোমাদের মধ্যে আমানতদার লোক কম হবে ও আমীর (বা নেতার সংখ্যা) বেশী হবে, ফকীহ (বা প্রকৃত আলেমের সংখ্যা) কম হবে ও ক্বারী (কুরআন পাঠকারীর) সংখ্যা বেশী হবে, দ্বীন ছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করা হবে এবং আখেরাতের আমল দ্বারা পার্থিব সামগ্রী অনুসন্ধান করা হবে।'
(আব্দুর রাযযাক ২০৭৪২, ইবনে আবী শাইবা ৩৭১৫৬, সহীহ তারগীব ১১১)

عَن مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ العِبَادَةُ في الهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ رواه مسلم

অর্থাৎ, মা'ক্বিল ইবনে য়্যাসার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফিতনা-ফাসাদের সময় ইবাদত-বন্দেগী করা, আমার দিকে 'হিজরত' করার সমতুল্য। (মুসলিম ৭৫৮৮, মিশকাত ৫৩৯১)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَيْرُ النَّاسِ فِي الْفِتَنِ رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ - أَوْ قَالَ: بِرَسَنِ فَرَسِهِ - خَلْفَ أَعْدَاءِ اللَّهِ يُخِيفُهُمْ وَيُخِيفُونَهُ، أَوْ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي بَادِيَتِهِ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي عَلَيْهِ

অর্থাৎ, ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফিতনায় সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে আল্লাহর দুশমনদের পিছনে ধাওয়া করে, তাদেরকে ভয় দেখায় এবং তারা তাকে ভয় দেখায়। আর সেই ব্যক্তি, যে কোন বেদুঈন (জনহীন) এলাকায় পৃথক বসবাস ক'রে তার উপর আল্লাহর (নির্ধারিত) হক আদায় করে। (হাকেম ৮৩৮০, ৮৪৩৩, সিলসিলা সহীহাহ ৬৯৮)

عن أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ قَالَ قَالَ رسول الله ﷺ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالَ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ

অর্থাৎ, আবূ সা'লাবাহ খুশানী কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের পরবর্তীতে আছে ধৈর্যের যুগ। সে (যুগে) ধৈর্যশীল হবে মুষ্টিতে অঙ্গার ধারণকারীর মতো। সে যুগের আমলকারীর হবে পঞ্চাশ জন পুরুষের সমান সওয়াব। জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! পঞ্চাশ জন পুরুষ আমাদের মধ্য হতে, নাকি তাদের মধ্য হতে?' তিনি বললেন, না, বরং তোমাদের মধ্য হতে! অন্য বর্ণনায় আছে, তোমাদের পঞ্চাশজন শহীদের সমান সওয়াব! (আবূ দাউদ ৪৩৪৩, তিরমিযী ৩০৫৮, ইবনে মাজাহ ৪০১৪, ত্বাবারানী ১৮০৩৩, সহীহুল জামে' ২২৩৪)

তথ্যসূত্রঃ

১। আল কুরআন
২। সিহাহ সিত্তাহ
3। Sunnah.com
4. hadithbd.com
5. মাসিক আল কাউসার
৬।দৈনিক কালের কণ্ঠ (https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/2020/03/07/882903)